ত্রিপুরা থিয়েটার

TRIPURA THEATRE 2023

UGC CARE LISTED JOURNAL

TRIPURA THEATRE TRIPURA THEATRE TRIPURA THEATRE TRIPURA THEATRE

Published with the Financial Assistance
of Sangeet Natak Academy, New Delhi

ত্রিপুরা থিয়েটার

অষ্টাদশ বর্ষ
(২০০৬ থেকে নিয়মিত)

TRIPURA THEATRE

Tripura Theatre is indexed in UGC Care List
ত্রিপুরা থিয়েটার ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত

TRIPURA THEATRE
Since 2006
Vol - 18, Issue - 1

ত্রিপুরা থিয়েটার-২০২৩

থিয়েটার বিষয়ক নাট্যগ্রন্থ

নাট্যদল ত্রিপুরা থিয়েটার কর্তৃক উপস্থাপিত

অষ্টাদশ বর্ষ

অক্টোবর- ২০২৩

প্রচ্ছদ

প্রণবশ্রী হাজরা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

মাইক্রো গ্রাফিক্স, আগরতলা

ত্রিপুরা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত

TRIPURA THEATRE

A Journal on Theatre and Performing Arts

A Publication of Tripura Theatre (Drama Group) Agartala

18th Year, October - 2023

UGC Care List Sl. No. 1, Discipline - Art & Humanities

Sub-Arts & Humanities (All), Focus Subject - Visual Arts & Performing Arts

Cover Design - Pranabsree Hazra

Type Setting and Printed at :

MICRO GRAPHICS, 6-A, Mantribari Road, Agartala.

Published by Tripura Theatre

Price ₹. 600.00

সূচিপত্র

নাট্য আন্দোলনে গন্ধর্ব নাট্য পত্রিকা
অপূর্ব দে - ১০

অত্যাচারীর কৌশল ও নাটক "কবর"
পাতাউর জামান - ১৮

এ আই-এর নাটক, নাটকীয় এ আই
বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য - ২৮

রবীন্দ্র-নাটকে শুক্রাচার্য রাভার অভিনবত্ব
বরুণ কুমার সাহা - ৩১

ধর্ম-মোহ থেকে প্রেমের পথে যাত্রা :
সাইমন জাকারিয়ার 'বোধিদ্রুম' নাটক
পরমাশ্রী দাশগুপ্ত - ৪০

বাউল নিপীড়ন ও
ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ
জামসেদ আনোয়ার তপন - ৪৯

সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস
নাট্যচর্চায় এক নতুন সম্ভাবনা
সঞ্জয় কর - ৫৩

ত্রিপুরায় বাংলা পথনাটক
সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা
মলয় দেব - ৫৮

সন্মাত্রানন্দের নাটকের একটি বিশ্লেষণী পাঠ
দেবশ্রী পাল - ৭০

কমল রায়চৌধুরীর নাটক
একটি পর্যালোচনা
পদ্মকুমারী চাকমা - ৮১

তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' ও
মনোজ মিত্রের 'পাখি' নাটকে
মধ্যবিত্ত সমাজমানস : একটি নিবিড় পাঠ
দীপঙ্কর সাহা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য - ৯০

শেখর দেবরায়ের নাটক "মনসাকথা"
একটি পর্যালোচনা
সুতপা চক্রবর্তী - ৯৮

বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম আধুনিক
নাটককার মধুসূদন দত্ত
অহীনা দে - ১০৬

অসমিয়া বেতার নাটক
প্রসঙ্গ ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার
'শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট'
জাহ্নবী দাশ - ১১০

'ছেঁড়া তার' নাটকে মন্বন্তরের অভিঘাত ও
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক
রূপশ্রী দেবনাথ - ১১৭

নাট্যকার সুকুমার
সুচিত্রা বেরা - ১২৩

প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর 'গুণধরের অসুখ'
স্বতন্ত্র নাট্যশৈলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন
প্রিয়ব্রত নাথ - ১৩০

দেশভাগ : সব হারানোর কথকতা
প্রসঙ্গ বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর'
রাজীব ঘোষ - ১৩৬

নাট্যকার সুকুমার

■ সুচিত্রা বেরা

অদ্ভুত, আজগুবি, অসম্ভব বিষয়ের অমর সৃষ্টিকর্তা সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৪) অনন্যসাহিত্য ভাণ্ডারের রত্ন তাঁর নাটকগুলি। মোট আটটি নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলা শিশু সাহিত্যে নাটক লেখার নতুন পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর ছড়াগুলোতে যেমন হাসির মাঝে সমাজব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকে, নাটকগুলো কিন্তু বেশিরভাগই নির্মল হাস্যরসে ভরপুর। ১৯১০-১১ সালে গড়ে তোলেন 'নন্‌সেন্স ক্লাব' নামে একটি আড্ডা স্থান। এই ক্লাবের জন্যই লেখেন প্রথম দুটি নাটক 'ঝালাপালা' (১৯১১) ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' (১৯১১)। অন্যান্য নাটকগুলো হল : 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি', 'চলচিত্ত চঞ্চরি', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'ভাবুক সভা' এবং 'মামাগো'।

হাস্যরস ও ব্যঙ্গ এই বিষয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে 'ঝালাপালা' নাটকটিতে। নাটকের মূল কাহিনি অনাবশ্যক, অবাঞ্ছিত এবং সুযোগসন্ধানী কিছু মোসাহেবদের অত্যাচার থেকে এক জমিদারের তার উকিল -মামার সাহায্যে পরিত্রাণ প্রাপ্তি। পণ্ডিত, কেষ্টা, ঘটিরাম, জমিদার, দুলিরাম, খেটুরাম, ভৃত্য রামকানাই, ওস্তাদ কেবলচাঁদ, মামা কেদারকৃষ্ণ মিলে নাটকে হাসির হাট খুলে বসেছে। তিনটি দৃশ্যে মোট ছয়টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। হাসি ঠাট্টার মধ্যে নাটকে যে ব্যঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে সেগুলো স্পষ্ট হয়েছে গানগুলোর মধ্য দিয়ে। যেমন দ্বিতীয় দৃশ্যে জমিদারের কিছু মোসাহেব জমিদারের জন্য এক গানের মজলিসের আয়োজন করতে ব্যস্ত। সেখানে গায়ক এবং শ্রোতা উভয়ই গান সম্বন্ধে অজ্ঞ। দুলিরামের কথায় " আমাদের কাছে 'গা'-ও যা 'ধা'- ও তাই— সবই সমান,"[১]। জমিদারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করা এই অযাচিত সুবিধাবাদী লোকগুলোর প্রকৃতির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে জুড়িদের গানে:

(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার।
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার।।

....

(এরা) খাচ্ছে দাচ্ছে ফূর্তি কচ্ছে নিত তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘন্টা মারচে আড্ডা বখশিশাদির সন্ধানে।।
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হল্লা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যের ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক।।
(আহা) একজন বড্ড সাধাসিধে ভেদ করে না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা স্বার্থপর।।[২]

শিক্ষা, সংগীত বিষয়ে অপটু ও অনভিজ্ঞ এই গ্রাম্য লোকেদের আচরণে নাট্যকার পরিহাস করেছেন। গ্রামের পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের দৌড় কতটুকু, তা বোঝা যায় যখন কেষ্টা 'আই গো

আপ, ইউ গো ডাউন' এর মানে জিজ্ঞেস করে। পণ্ডিতের উত্তর " 'আই'— 'আই' কিনা চক্ষুঃ'গো'—গয়ে ওকারে গো— গৌ গাবৌ গাবঃ ইত্যমরঃ 'আপ্' কিনা আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল— গরুর চক্ষে জল— অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে — কেন কাঁদিতেছে— না 'উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা— 'গো ডাউন', অর্থাৎ গুদোমখানা — গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না — তাই না দেখে, 'আই গো আপ'— গরু কেবলি কান্দিতেছে—"[৩]।

ব্যঙ্গ -বিদ্রূপ বহির্ভূত কৌতুকপূর্ণ নাটক 'অবাক জলপান' (১৯২১)। শব্দ সৃষ্টি নিয়ে সুকুমারের কারবার। তিনি 'জল' শব্দের বহুমাত্রিক ও বিবিধ ব্যবহার দেখিয়ে শিশুদের বেশ চমকপ্রদ জলপান করিয়েছেন। জলের সন্ধানরত এক পথিক সাহায্য চেয়ে কেবল জ্ঞান পেয়েছে। গ্রামের লোকগুলো অস্বাভাবিক ও আপন সংকীর্ণ স্বার্থে বন্দি। নাটকটি বয়স্কদের পাঠযোগ্য হলেও, মূল লক্ষ্য নাবালক পাঠকশ্রেণি। এই নাটক বিষয়ে নবেন্দু সেনের মন্তব্য- "...তুলনামূলকভাবে এ রচনাটির শিল্পগুণ পূর্বে আলোচিত নাটকগুলির (সুকুমারের অনান্য নাটক) শিল্পগুণ থেকে অনেকটা বেশি সরল বোধ হয় একটু স্থূলও। শব্দের যমকে, পানে সৃষ্ট এর হাস্যরসে নব নব খুশির জোয়ার এসে লাগেনি। পদ্ধতির একঘেয়েমিতায় নতুন চিন্তাশক্তির জোরালো দ্যুতি নেই"[৪]।

হাসি- ঠাট্টার পাশাপাশি শিশুদের নীতির শিক্ষা দিয়েছেন 'হিংসুটি'(১৯২১) নাটকটিতে। সবকটি চরিত্র বালিকা। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনে হিংসার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ছোট শিশু বোঝে না হিংসা কী, কীভাবে তা মনে বাস করে। হিংসার রূপ কালো, কুৎসিত, নোংরা। এই বিশ্রী রূপ দেখিয়ে শিশুদের মন থেকে হিংসাভাবের বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সুকুমার রায়ের এই একই বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র ছড়াও রয়েছে। নাম 'হিংসুটিদের গান'। কিছুটা অংশ নিচে তুলে ধরা হল:

" আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা ত তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম কম"[৫]।

বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভরপুর একটি নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। এর আদিনাম ছিল অদ্ভুত রামায়ণ।[৬] গদ্য পদ্যের সংমিশ্রণে লেখা, আগাগোড়া হাসি-হাসি এই নাটকটি পাঠ করলে ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া কোনো রামায়ণ নাটকের মঞ্চদৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই হাসির আড়ালে কোনো প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ উঁকি দেয় না। এ শুধু নির্মল হাসি। চরিত্রগুলো এখানে আরও সজীব। রক্ত-মাংসের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রক্ত-মাংসের প্রত্যক্ষ দেখা সাধারণ বাঙালি ঘরের চরিত্র বলে মনে হয়। রাম-রাবণের গুরু-গম্ভীর রাজবৈশিষ্ট্য প্রাত্যহিকতার সারল্যে মজার চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তাদের শত্রুতা এখানে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। চারটি দৃশ্যে (রামের শিবির, রণস্থল, রামচন্দ্রের শিবির, শিবির

প্রাঙ্গণ) রাম-রাবণের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের আহত হওয়া এবং সেরে ওঠার গল্প বলা হয়েছে। নাটকের শুরু রামের রাজস্বপ্ন দর্শন দিয়ে, "কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়েছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে— পাপত চ, মমার চ!"[৯]। শুনে সকলে আশা করে রাবণ বোধহয় 'এক্কেবারে মরে গেছে।' দূত খবর নিয়ে আসে রাবণ মরেনি, বরং যুদ্ধ করতে 'আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল'। তখন সুগ্রীব, বিভীষণ,লক্ষ্মণ, হনুমান চলে বীরত্ব দেখাতে রণস্থলে। রাবণকে সত্যি সত্যি আসতে দেখে সকলের বীরত্ব ঘুচে যায়, কেবল সুগ্রীব সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয়। কিন্তু রাবণের এক প্রহারে সুগ্রীবের অবস্থা ' ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি'। পলায়নরত সুগ্রীবকে দেখে রাবণের উক্তি , " ছি, ছি, ছি— এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্! শেম!"[১০]

এবার লক্ষ্মণের পালা। রণক্ষেত্রে নেমেই রাবণ কর্তৃক শক্তিশেলাহত হয়। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে এক বিরল হাসির দৃশ্য —লক্ষ্মণের মূর্ছা যাওয়ার সুযোগ রাবণ তাঁর পকেট লুণ্ঠন করে। সংবাদ পেয়ে সকলে রাবণের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে বলতে থাকে 'রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো।' আর লক্ষ্মণের দুর্দশার দায় সুগ্রীব হনুমানের কাঁধে দেয় এবং আট আনা জরিমানা হয় তার। মন্ত্রী জাম্বুবান লক্ষ্মণের চিকিৎসার 'প্রেসক্রিপশন' লিখে হনুমানকে বিশল্যকরণী, মৃত সঞ্জীবনী আনতে কৈলাশে পাঠায়। হনুমান অনেক ওজর আপত্তি দেখায়। হোমিওপ্যাথি করতে বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলা বকশিস্ পেয়ে রওয়ানা হয়। এর পর বিভীষণের পাহারাদারিতে যমদূতেরা শিবিরে ঢুকতে বাধা পায়। তখন স্বয়ং যমরাজ এসে উপস্থিত হয় সেখানে। বিভীষণের সঙ্গে একপ্রস্থ সদর্প বাক্যালাপ চলে তাঁর। হঠাৎ হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে প্রবেশ করে এবং যমের মাথায় স্থাপন করে। পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে যমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার যমদূতেরা তাদের তেরো আনা মাইনের জন্য মড়াকান্না জুড়ে দেয়। ইতিমধ্যে ওষুধ খেয়ে লক্ষ্মণ সেরে ওঠে। তখন এই মহৎকর্মের বাহাদুরি ও বাহবা নেওয়ার প্রতিযোগিতা চলে সকলের মধ্যে। এবং এই সঙ্গে গল্পে নটে গাছটি মুড়োলো আর 'মহানাটকের ' সমাপ্তি হল।

এই নাটকে বেশ কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি', 'বজ্র আটুনি ফসকা গেরো', 'পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে', 'শখের প্রাণ গড়ের মাঠ'।

'ভাবুক-সভা' (১৯১৪)পদ্যে রচিত ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাটক। ১৯১৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। এটি ছিল সচিত্র নাটক। পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকটিতে সুকুমারের আঁকা ছবিটিতে ছিল 'জ্যোৎস্না রাতে জলের ওপর একটি ঝুঁকে পড়া ডালে ভাবুকদাদা তাঁর কবিতার খাতা ও কলম হাতে খাতার দিকে নিমগ্নচিত্তে চেয়ে বসে আছেন। তাঁর উড়নির একাংশ জলে ঝুলে পড়েছে, অন্য অংশ হাওয়ায় উড়ছে"[১১]। একজন সিনিয়র ভাবুক এবং দুজন ছোকরা ভাবুক নাটকের চরিত্র । সকলে মিলে ভাবের মাহাত্ম্য শুনিয়েছে, নানান ভাবনার কথা বলেছে। নাটক শুরু হয়েছে 'ভাবের ঝোঁকে একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত"

ভাবুকদাদাকে নিয়ে। যখন মনে ভাবের প্রচণ্ড বেগ আসে তখন মানুষের আত্মা বাস্তব জগতের উর্দ্ধে পৌঁছে যায়। সেই ভাবকে অবলম্বন করে মানবাত্মা ভবনদী পার হতে চায়। এই ভাব থেকেই হয় সৃষ্টি। মানুষের মনের ভাব সৃষ্টির ভাষা খুঁজে — "অব্যক্ত ভাবনাগুলো যেন মূর্তিলাভ করিবার সুযোগ-অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে"[১০]। সব ভাব প্রকাশিত হতে পায়না। কিন্তু ভাবুকের মনে ভাবের খোরাকের অবধি নেই। 'ভাবের টেঁকি' সর্বদাই পড়ছে। সুতরাং "গতস্য শোচনা নাস্তি'। এক মানুষের মনের ভাব অন্য মনে সঞ্চারিত হয়। তাই জীবনে সাহিত্যের এত কদর। যুগ যুগ ধরে শত সহস্র ভাব এসেছে। মানুষ ভাবের সাগরে ডুব দিয়েছে পার্থিব জগৎ-জ্ঞানশূন্য হয়ে। অনেক ভাব হারিয়ে গেছে, অনেক ভাব ভাষা খুঁজেছে। এই তত্ত্বকথা সুকুমারের লেখনীতে মজার রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় এই নাটকটি সুকুমারের কণ্ঠে শোনার এক মনোরম অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন:

'ভাবুক-সভা' বড়দার ২০/২১ বছর বয়সে লেখা বোধহয় সন্দেশে বেরিয়ে থাকবে, আমাদের পড়া জিনিস। কিন্তু পড়া যে এমন রঙ্গ-রসে ভরা হতে পারে এ আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। সে কি মুখ-ভঙ্গি, সে কি হাত পা নাড়া, কথার মধ্যিখানে সে কি রস। সাজ নেই, দৃশ্যপট নেই, প্রকৃতির সেই দৃশ্যপটের মধ্যিখানে এ কি রসের ধারা?[১১]

ভাবরে মূল বস্তু হচ্ছে রস। ভাব অর্থের ধার ধারে না। তাই অভিধান , ব্যাকরণ, পঞ্জিকা সবই ভাবুকের কাছে বুজরুকী আর গাঁজার সমান। তাই ভাবুকের দল ভাবের নামতা আওড়ায় " ভাবের পিঠে রস, তার উপরে শুন্যি"। ভাবুকের এবং ভাবরাজ্যের তত্ত্ব অতি সুক্ষ্ম বিষয়। আর এই গুরু বিষয়টিকেও সুকুমার রায় বিশুদ্ধ হাসি -কৌতুকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এককথায় 'ভাবুক-সভা' "ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে ঠাসা"। "ভাবুক-সভা'র ভাবই সুকুমারের পরবর্তী নাটক 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' এ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভাবুকদাদার "অর্থ! অর্থ ত অনর্থের গোড়া!" উক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' এর উৎস। ১৯১৫ সালে 'অলকা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় নাটকটি। এটিকে শিশুনাটক ঠিক বলা যায় না। এর রস শিশুদের বোধগম্য নয়। দ্রুম' অর্থাৎ বৃক্ষ 'কল্পদ্রুম' 'অভীষ্টফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ। যাহার কাছে কিছু চাহিলেই পাওয়া যায়। "[১২] সুতরাং বলা যেতে পারে ' শব্দকল্পদ্রুম' এক অর্থ এমন এক বৃক্ষ যেখানে ইচ্ছানুসারে শব্দ পাওয়া যায়, অর্থাৎ মানুষের মস্তিস্ক।

নাটকের চরিত্র আশ্রমের গুরুজি আর তাঁর শিষ্যবৃন্দ হরেকানন্দ, জগাই, বেহারী, পটলা ও বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর এখানে অনেকটা বহিরাগতের মতো। নাটকের গুরুজির মূল বক্তব্য শব্দ অর্থহীন বা 'অর্থই শব্দের বন্ধন'। আর এই বন্ধন ছিন্ন করে "শব্দের বিষদাঁত অর্থকে ভেঙে সশিষ্য স্বর্গারোহন করতে চেয়েছিলেন। আশ্রমের শিষ্য বেহারীর এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনে অর্থ বোঝাতে গুরুজি শব্দসংহিতার প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে "শব্দই আলোক। শব্দই বিশ্ব— শব্দই সৃষ্টি শব্দই সব। ... শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়, ... শব্দ ব্রহ্ম" [১৩]। কিন্তু যে শব্দের স্বরূপ অর্থ, সেই শব্দশক্তিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। অথচ মানুষের

চিন্তা ও ভাবের প্রকাশ যে বাক্যে তার প্রকাশ অর্থযুক্ত শব্দে। কিন্তু তিনি 'শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে' চাপাতে বারণ করেছেন। কারণ এতে 'শব্দশক্তি ম্লান' হয়ে যায়। শব্দশক্তি এখানে অর্থহারা শব্দরূপের শক্তি অর্থাৎ আক্ষরিক শব্দশক্তি। গুরুর সমস্ত বক্তব্য লঘু করে দিয়েছে একমাত্র বিশ্বম্ভর। গুরুজির কথায় তার মনে পড়ে গিয়েছে ছেলে বেলায় লেখা এক পদ্যের কথা ('কাছে এসে ঘেঁষেঘেঁষে এত ভালোবেসে বেসে / টাকা মেরে পালালি শেষে') ।শব্দ প্রসঙ্গ তার মনে পড়ে মতিলালের ভুঁইপটকার কথা এবং সেখান থেকে সোজা গুরুজির ন্যাজ নিয়ে কথা ওঠে। গুরুজির সশিষ্য স্বর্গারোহণের পথে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল বিশ্বম্ভর। কারণ তার শরীরের ভার এবং দ্বিতীয়ত সে ভাবছিল। গুরুজির মতে শব্দলোকে ভাবের কোনো স্থান নেই। এরপর আবির্ভাব হয় বিশ্বকর্মার। 'শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই'? বলে তিনি শব্দকল্পদ্রুম নিক্ষেপ করেন এবং "দ্রুম' শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন"। এই দৃশ্যেই আছে সেই বিখ্যাত মন্ত্র,

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইঁটপাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা নেইমামা তাই কানামামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি ধর্মতলায় কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দিকাশি ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।[১৪]

'চলচিত্ত-চঞ্চরি'(১৯২৭) নাটকে সুকুমারের ব্যঙ্গ ও রাগ সবথেকে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৫-১৬ সালে রচিত এই নাটকটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে গবেষক নবেন্দু সেন লিখেছেন:

"এখানে চলচিত্তচঞ্চরি নামক অসার, আজগুবি, বই অবলম্বনে ছোটদের জন্যে , 'স্কুলস্টোরি বুক' লেখার অক্ষমতার প্রতি মৃদু কটাক্ষপাত করা হয়েছে।"[১৫]

চারটি দৃশ্যে গঠিত এই নাটকে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশে ঘটেছে। চরিত্রগুলো দুটো দলে বা সভায় বিভক্ত। একদল সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা, এবং অন্যদল শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম। দুটি দলের মধ্যে রেষারেষি অবশ্যই আছে, তার ওপর দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগী মনোভাব রয়েছে। যেমন ভবদুলালের অভ্যর্থনার সময় ঈশান বলেছে 'আমার গানটা আগে হয়ে যাক'। সত্যবাহন প্রতিবাদ করেছে 'ওসব গানটানে কাজ নেই... আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে'। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয় 'গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক'। 'নিজের ঢাক নিজে পেটাতে' ওস্তাদ ঈশান ও সত্যবাহন। যখনই সুযোগ পেয়েছে তারা তাদের রচিত গ্রন্থাদির 'বিজ্ঞাপনের চটক' দিতে ছাড়েনি।

এই দুই দলের কোনোটিতেই যে পড়ে না সে হল ভবদুলাল। ভবদুলাল চরিত্রে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছেন সুকুমার রায়। এই নাটকে তিনি সভা-সমিতি নিয়ে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। এবং এই নাটকেরই একটি চরিত্র হয়ে সভা ভণ্ডুল করেছেন এবং সভ্যদের নাস্তানাবুদ করেছেন। যার ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সাম্য সভার সদস্যরা মিলে তার লেখার খাতাটি

ধ্বংস করেছে।

আসলে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি সভা-সমিতির প্রতি রাগ প্রদর্শন করেছেন। একসময় যে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসভায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল তারই কিছুটা ছায়া পড়েছে নাটক রচনার প্রেক্ষিতে। এবং এই সব সভায় যে অহেতুক, অনাবশ্যক তত্ত্বালাপ ও বাক্যালাপ চলে তারই প্রতি কটাক্ষ করেছেন। ভবদুলালকে দেখে বোকা-বোকা, অস্বাভাবিক মনে হলেও আসলে সে আত্মসচেতন ব্যক্তি। সভার সমস্ত রকমের গুরু-গম্ভীর আলোচনাকে সে ব্যর্থ করেছে নানাভাবে। সমীক্ষা মন্দিরে যখন সবাই নিঃশব্দে সাধনায় রত, তখন ভবদুলাল সশব্দে প্রবেশ করে, এবং তার ছোটবেলায় পাগলা বেড়াল কামড়ানোর গল্প বলে সমস্ত বিষয়টাকে উল্টে দিয়েছে। পরিস্থিতি দেখে ঈশান যখন বলে ওঠে "দেখুন, এটা হাসবার এবং গল্প করবার জায়গা নয়", তখন ভবদুলালের পাল্টা জবাব " তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন"।

ভবদুলালের সঙ্গে দাশুর চরিত্রের একটা মিল রয়েছে। তাদের দেখে পাগল ও বোকা মনে হয়। কিন্তু তাদের সংলাপে বোঝা যায় তারা বাস্তবে সচেতন এবং স্বাভাবিক। ভবদুলাল বার বার বলেছে তার মাথার অসুখ, " আমার আবার মাথার ব্যামার আছে কিনা।" কিন্তু সে তাদের সমস্ত যুক্তির কথা তাদেরই ফিরিয়ে দিয়েছে সময়ে-সময়ে। সত্যবাহন তাঁর 'অখণ্ড -সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের তত্ত্বব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে "ঘোড়া চতুস্পদ, গরু চতুস্পদ, ঘোষ পোষ মানে, গরু পোষ মানে— সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড হিসাবে কোনো তফাৎ নেই।" নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখি ভবদুলালের মাথার ব্যামোর কারণ হিসাবে সে সজারুর কথা বললে ঈশান প্রতিবাদ করেছে। তখন ভবদুলালের যুক্তি " ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখবার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু ত আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্বিশেষম্"।[১৬] শেষ পর্যন্ত সকলে ভবদুলালের ওপর চটে যায়। নাটকের শেষে সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার সদস্যরা ভবদুলালের লেখার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেললেও সে ঘোষণা করেছে " খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তো কি হয়েছে। আবার লিখব— চলচিত্তচঞ্চরি— লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড় বড় করে সোনার জলে লেখা চলচিত্তচঞ্চরি— পাবলিশড বাই ভবদুলাল"[১৭]।

'সন্দেশ' এ প্রকাশিত 'মামাগো' (১৯২১) সুকুমার রায়ের নাটকগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুদ্র। নির্ভেজাল হাস্যরস ও আনন্দে ভরপুর এই নাটকে দুটি চরিত্র বালক ও তার মামা। বালক নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেভাবে কথার মারপ্যাঁচে মূল বক্তব্যটি পেশ করেছে তাতে নাটকে দারুণ কৌতূকময় ও মজার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বালকের একটাই চাহিদা, তা হল মামার থেকে প্রাইজ নেওয়া। সেই কথা বলার জন্য সে নানা কথার প্রসঙ্গ টেনে আনে। ঘুমন্ত মামাকে ডেকে তুলে কাঁদো কাঁদো সুরে জানায় যদি ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায়, কিংবা হঠাৎ তাদের বাড়ির উপড়েই বা এসে পড়ে, কিংবা গোবিন্দর মামার মতো তার মামাটিও মরে যায়— কে কতদিন বাঁচবে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। মামা রেগে আসল কথা জানতে চাইলে বালক প্রকৃত সমস্যার কথা

বলেছে, " তুমি যে বলেছিলে আমাকে প্রাইজ দেবে— কই দিচ্ছ না ত"; ধমক ও চড় মেরে মামা জানায় " যা! আজ বিকেলে প্রাইজ পাবি এখন"। তখন হাসতে হাসতে এবং গাল ঘষতে ঘষতে বালক প্রস্থান করে।

"ঝালাপালা" সুকুমার রায়ের প্রথম নাটক হলেও, এর আগে 'রামধন বধ' নামে একটি ছোট নাটক তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। মাত্র আটটি নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, সমাজমনস্কতা ও ধর্ম সমাজ শিক্ষা রাজনীতির অসংগতির দিকগুলি কৌতূকরস মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন। তাঁর লেখা মুক্ত, বিশুদ্ধ হাসি আর আনন্দে ভরা।

পাদটীকাঃ

১। সুকুমার রায়, সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৮, পৃ.২৭৭।
২। ঐ, পৃ. ২৭৬, ৩। ঐ, পৃ. ২৭৪,
৪) নবেন্দু সেন, "প্রসঙ্গায়নে বাংলা শিশুসাহিত্য", সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ১৯৯২, পৃ.১২৭।
৫। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬, ৬। নবেন্দু সেন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৪, ৭। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০, ৮। ঐ, পৃ. ২৯৩,
৯। হেমন্তকুমার আঢ্য, "সুকুমার রায়: জীবনকথা", পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ১৯৯০, পৃ.৬২।
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাহিত্য সৃষ্টি", সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩১৪, পৃ.৯১।
১১। লীলা মজুমদার , "পাকদণ্ডী", আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৮৬, পৃ.৬০।
১২। রাজশেখর বসু (সংকলিত), "চলন্তিকা", এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা-৭৩, পৃ.১৩০।
১৩। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৩২-৩৩৩। , ১৪। ঐ, পৃ. ৩৩৯। , ১৫। নবেন্দু সেন, প্রাগুক্ত, পৃ.-১২৭। , ১৬। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩২৬। , ১৭। ঐ, পৃ. ৩২৬।

লেখক ঃ **সুচিত্রা বেরা, গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি, আসাম।**
Writer : **Suchitra Bera, Scholar, Cotton University, Guwahati, Assam.**